এবারের মরুপলাশ এর মহান মে দিবসের এই বিশেষ আইকনে যে সকল লেখকগন তাঁদের লেখায় এবং মেধা মনণ দিয়ে অংশগ্রহণ করেছেন তারা হলেন... ...প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেন, এ এফ এম ফতেউল বারী রাজা, এ দুজনেই লিখেছেন মে দিবসের উপর দু'টি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ। যাতে রয়েছে মে দিবসের রক্তে রঞ্জিত প্রায় পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। ড. মশিউর রহমান একজন বিজ্ঞানী যিনি মরুপলাশ এ নিয়মিত কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের উপরই বেশী লিখছেন। তিনিই এবার লিখেছেন এক ব্যতিক্রমধর্মী কবিতা **এক ধর্ষিতা নারীর কথা**, অরপি আহমেদ সম্ভবতঃ খবর.কম এর সম্পাদনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যদিও তিনি তার পরিচয় প্রকাশ করেননি। তবে তিনি নিয়মিত কবিতা লিখেই পাঠাচ্ছেন মরুপলাশ এ। তাই এবার তার তিনটি ভিন্নস্বাদের কবিতা সংকলিত করা হয়েছে। মে দিবসের এই বিশেষ দিনে আমরা সংগ্রামী কানসাটবাসীদেরকেই বেশী মনে রেখেছি। এবং তাদের সংগ্রামী চেতানার মাঝে যে ক্ষিপ্ততা, যে তেজ দীপ্ততা রয়েছে, যা তারা বাঁশের লাঠির মাধ্যমে প্রদর্শন করেছেন। তাঁদের জানাই মে দিবসের লাল সালাম। তাদের প্রতি সম্মান রেখেই তাদের সেই সংগ্রামী দৃশ্য দিয়েই এবারের মে দিবসের প্রচ্ছদ করা হয়েছে। এই আইকনের সর্বশেষে রয়েছে মহান মে দিবসকে নিয়ে একগুচ্ছ ছড়া।

সকল মেহনতী মানুষের জয় হোক।

দেওয়ান আবদুল বাসেত

প্রকাশনার ১১ বছর

সম্পাদক
মরুপলাশ, রুপসী চাঁদপুর, মোহনা
রিয়াদ,সউদী আরব।
২৯এপ্রিল২০০৬ইং
Emai: marupalash@gmail.com
marupalash@yahoo.com
www.marupalash.com

দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা শুধিতে হইবে ঋণ

রক্তভেজা পহেলা মে নারী ও শিশু শ্রম প্রাসঙ্গিক ভাবনা

প্রকৌঃ মোঃ দেলোয়ার হোসেন

''ক্লান্তশ্বাস ছুঁয়েছে আকাশ, মাটি ভিজে গেছে ঘামে,
জীবনের সব রাত্রিকে ওরা কিনেছে অল্প দামে।
অনেক দুঃখে, বহু বেদনায়, অভিমানে, অনুরাগে,
ঘরে তাঁর প্রিয়া একা শয্যায় বিনিদ্র রাত জাগে।''

প্রায় সাড়ে চার যুগ আগে, একজন শ্রমজীবী মানুষের দরাজ গলায় কবি কিশোর সুকান্ত ভট্টচার্য রচিত 'রানার' কবিতাটি আবৃত্তি । আমি শুনেছি তখনো মাতৃভাষা বাংলার শব্দার্থ শেখা শুরু হয়নি আমার। তবুও তন্ময় হয়ে শুনতাম সে আবৃত্তি। তারপর যতই দিন ফুরাতে শুরু করলো, আমি আস্তে আস্তে পরিচিত হলাম ঘাম ঝরানো শরীরের সাথে। সময় বাড়তে থাকলে 'শ্রম' নামক শব্দটিও আমার পরিচিত হয়ে ওঠলো। কবিতাটির আবৃত্তি কারক আমার শ্রমজীবী বাবা। যিনি তাঁর নিজেরও সন্তান সজনের আহার, বসন, চিকিৎসাসহ বেঁচে থাকার রসদ যোগাতে, ক্লান্তিকর পরিশ্রম করতেন। পরিশ্রান্ত মানুষের ক্লান্ত অবয়ব দেখতে দেখতে আমি উদ্বৃত চারটি চরণের শব্দার্থ শিখেছি।

বহু পরে স্বীয় শরীর থেকে ঝরা রক্ত ঘাম আমাকে কবিতার কবিকে চিনিয়েছে। ছোট বেলায় ঘুম হঠাৎ ভাঙ্গলে, শয্যায় মাকে না পেয়ে যখন কান্না করতে করতে খুঁজতে গিয়েছি, তখন দেখেছি তিনি ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সোহাগের হাত বাড়াতে পারছেন না- তার হাত দুটো প্রায়ই ব্যস্ত থাকতো পুকুর ঘাটে বাসন-কোসন ধোয়ার কাজে। ভোর থেকে শুরু হতো মার হাড়ভাঙ্গা খাটুনী চলতো গভীর রাত অব্দি। শ্রমজীবী মানুষের শরীর নিংড়ানো ঘামের স্রোত নদী হয়ে, পৃথিবীকে পুষ্ট করতে থাকলো, আমিও আস্তে আস্তে ক্লান্তিহীন ও ক্লান্তিকর শব্দ দু'টোর পার্থক্য বুঝতে শিখলাম। বয়স বাড়লে দেখলাম কি করে এক শ্রেণীর মানুষ অপেক্ষাকৃত দুর্বল শ্রেণীর শ্রম লোপাট করে স্ফীত হচ্ছে।

শুনেছি, মানুষের বুদ্ধি যখন খুব বেশি বাড়েনি, যখন তারা প্রকৃতি নির্ভর ছিলো, খাবারের জন্যে ফসল ফলাতে জানতো না, বস্ত্রের বালাই ছিলো না, নারী-পুরুষ পরস্পরের সৌন্দর্য আবিস্কার করার প্রতিযোগিতায় নিয়োজিত হয়নি, তখন অপরের শ্রম চুরি হোত না। তারপর বহুদিন পরে যখন মানুষ গাছ থেকে ভূমিতে নামলো, নিজের শক্তি সমন্ধে জ্ঞাত হলো, ফসল ফলাতে শুরু করলো, পথের ছুড়তে শিখলো, গাছের ডালকে অস্ত্র বানিয়ে অন্যকে আঘাত করতে শিখলো তখনই মানুষ নিরামিষ ভোজী থেকে আমিষভোজী তথা মাংসাশী হয়ে ওঠলো। মানুষটির করাও হতে শুরু করলো, অনেক কিছু শ্রেণীভেদ শুরু হলো এক সময় তা প্রথায় রূপ নিলো।

সৃষ্টি হলো অত্যাচারী ও শোষক শ্রেণীর। অপরের শ্রমে ফলিত ফসল, শিকার করা পশু ছিনিয়ে নেয়া শুরু করলো সবলরা। সেই শুরু তারপর অনেক দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ার ইতিহাস। ইতিমধ্যে মানুষ বনের পশুকে পদানত করেছে। ওদের পদদলিত করে তাদের শ্রমে ভাগ বসিয়ে যে যাত্রা শুরু করে ছিলো শক্তিধর মানুষ, এক তা তাকে শক্তিধর অতিমানব বা দানবে রূপান্ত রিত করে অপেক্ষাকৃত শক্তিহীন মানুষকে নিজেদের প্রয়োজনে দাস-দাসী বানিয়ে ফেললো। অপরের শ্রমে অন্যায় ভাবে নিজের দেহে মেদ বাড়াতে শুরু করলো মানবরূপী দানবরা। ভোগ বিলাস জন্ম দিলো অমানবিক দাস প্রথার। প্রাগতৈহাসিক কাল থেকেই এই বৈষম্যের সুষ্টি । কত কাল আগে এক শ্রেণীর মানুষ বিধির বিধান অস্বীকার করে দানবে পরিণত হয়েছিলো তার ইতিহাস সঠিক ভাবে জানা সম্ভব হয়নি।

প্রথমে মানুষ ব্যবহৃত হতে শুরু করে কৃষি শ্রমিক হিসেবে। অপেক্ষা কৃত শারিরীক ভাবে দুর্বল নারী শ্রেণী ব্যবহৃত হয় হয় প্রথম কৃষি শ্রমিক হিসেবে এ পথ পরিক্রমা চলে দীর্ঘ সময় ধরে। কৃষি নির্ভর মানুষ কালে কালে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী কুঠির শিল্প গড়ে তোলে, জাওয়া কে বশ করে দাড়টানা নৌকার স্থলে পালতোলা জাহাজ নিয়ে সমুদ্র জয়ে বের হয়। নাবিক, কৃষক, শ্রমিক সব স্থানেই কষ্ট সাধ্য শ্রম ব্যয়িত হয়। কিছু স্বার্থপর মানুষ শ্রম ব্যবস্থাপনার নীতি বিবর্জিত পন্থা অনুসরণ করে, শুরু হয় শ্রমচুরি, এই অবস্থা দীর্ঘদিন চলে।

বলা চলে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত। ষোড়শ শতকের পর মেধাবী ব্রিটিশ প্রকৌশলী জেমস ওয়াট **(১৯৩৬-১৮১৯)** স্টীম ইঞ্জিন আবিস্কার করেন। তিনি বাষ্পকে রূপান্তরীত করেন শক্তিতে। হাওয়া নির্ভর পাল তোলা জাহাজের স্থান দখল করে নেয় বাস্পচালিত স্টীমার। শিল্প বিপ্লবের প্রচন্ড ধাক্কা পৃথিবীর অগ্রগতির ধারাকে বেগবান করে সত্যি, কিন্তু শ্রম বেচে যারা জীবিকা নির্বাহ করে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না। শোষকের রূপ বদলায় কিন্তু শ্রমিকের ক্লান্ত শ্বাস আকাশ ছুঁয়েই থাকে। নতুন কলকারখানার মালিকরা ভূ-স্বামীদের স্থান দখল করে নেয়। অল্প পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দরিদ্র শ্রমিকের রাত দিন দু'টোই কিনে নেয় তারা।

এক সময় শোষণ বঞ্চনা যাত্রাকলে পড়ে শ্রমিক শ্রেণী বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সে যুগসন্ধিকালে কিছু সাহসী শ্রমিক একত্রিত হয়, প্রতিবাদের ঝান্ডাতোলে তারা। শিল্প বিপ্লবের আগে কৃষিভিত্তিক সমাজে শিল্প ছিলো অনেক পশ্চাদপদ, কুঠির শিল্পই সে সময়ে মানুরেষর দৈনন্দিন প্রয়োজন পরিপূরণ করতো। তখনকার শিল্প গড়ে উঠতো, পরিবারকে কেন্দ্র করে, পরিবারের সকলে মিলেই সে-শিল্পে শ্রমিক প্রদান করতো, শ্রম পোষণের প্রক্রিয়া সে শিল্পে তেমন কার্যকর ছিল না। কিন্তু যখন বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া কুঠির শিল্পকে যন্ত্রভিত্তিক বৃহৎ শিল্পে পরিণত করলো, তখন থেকেই শ্রমিক শোষণের সূত্রপাত ঘটলো। পুঁজির মালিকরা পুঁজি খাটিয়ে বৃহৎ কারখানা স্থাপন করলো, আর সর্বহারা শ্রমিকরা সে কারখানায় সস্তায় তাদের শ্রম দান করতে বাধ্য হলো। পুঁজিবাদী যুগে শ্রমিকরা তাদের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেললো, সকলে পুঁজির দাসে পরিণত হলো।

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এক একটি কারখানায় শ্রমিকদের ১৮ থেকে ২০ ঘন্টা শ্রম দিতে বাধ্য করা হতো। অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাদের জীবন কাটাতে হতো। তাদের উপযুক্ত চিকিৎসার, চিত্তবিনোদনের কিংবা ছেলেমেয়েদের শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এই অমানবিক জীবনযাত্রা ও শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের প্রতিবাদ করার কোনো উপায় ছিল না। কোথাও যদি তারা সামান্য প্রতিবাদ হতো, তা হলে তাদের উপর নেমে আসতো অকথ্য নির্যাতন। অনেক শ্রমিক কারখানা মালিকের নির্মম অত্যাচারে প্রাণ হারাতো। নারী শ্রমিকদের অবস্থা ছিলো আরো খারাপ। গৃহকর্ম সেরে কারখানায় তাদের শ্রম দিতে হতো। কম মুজুরীর কারণে তাদের ভাগ্যে জুটতোনা প্রয়োজনীয় আহার, চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে স্বাস্থ্যহানী ও বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু ছিলো অবধারিত।

শ্রমিক শ্রেণী এ-অবস্থা বেশিদিন সহ্য করলো না। মালিক শ্রেণীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তারা সংগঠিত হতে লাগলো, তাদের ন্যায দাবি দাওয়া আদায়ের জন্য সোচ্চার হয়ে উঠলো। তাদের প্রধান দাবি হলো আট ঘন্টার কাজের। দিনে আট ঘন্টার বেশি পরিশ্রম করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই, তাদের এই দাবি মোটেই অসঙ্গত ছিল না। অথচ, এই একান্ত সঙ্গত দাবিও মালিকরা মেনে নিতে অস্বীকার করলো। পরুষের চেয়ে নারী শ্রমিকরা বেশি সোচ্চার হলো। কারণ বঞ্চনার শিকার নারীরাই বেশি ছিলো। ১৮৮৬ সালের ১লা মে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটের শ্রমিকরা আট ঘন্টার কাজের দাবিতে রাস্তায় নেমে এলো। সে দিনটি ছিল আমেরিকার বসন্ত উৎসবের দিন। উৎসবের দিনটিই শ্রমিকদের জন্য নিতান্ত বিষাদের দিনে পরিণত হলো। রাজপথে শ্রমিকদের শান্তিপুর্ণ প্রতিবাদ শোভাযাত্রায় পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালালো। শ' শ' শ্রমিকের বুকের রক্তে শিকাগোর রাজপথ হলো রঞ্জিত। তবু শ্রমিকরা পিছু হটলো না এভাবে প্রাণের বিনিময়েই শিকাগোর শ্রমিকরা তাদের ন্যায অধিকার ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হলো। ক্রমে ক্রমে সারা পৃথিবীতেই আট ঘন্টা কাজের দাবি স্বীকৃতি লাভ করলো। মে মাসের প্রথম দিনটি হয়ে উঠলো শ্রমিক শ্রেণীর বিজয়ের প্রতীক।

১৮৯০ সাল থেকে প্রতি বছরই পৃথিবীর মেহনতী মানুষ এই ঐতিহাসিক দিবসটিকে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করে আসছে। অবশ্য এর উনত্রিশ বছর আগে, **১৮৫৭** সালের ৮ মার্চ নিউইয়র্ক শহরে এক সুঁচ কারখানার নারী শ্রমিকরা অসহনীয় পরিবেশ, অমানবিক আচরণ, দিনমজুরী আর দৈনিক বার ঘন্টা শ্রমের মানবেতর জীবনযাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে স্বতস্ফূতঃ আন্দোলনে নেমেছিলো। নিউইয়র্ক শহরের পুলিশ সে দিন প্রতিবাদী নারী শ্রমিকদের ওপর অত্যাচারের তা□ব লীলা বইয়ে দেয়। আহত হয় বহু নারী শ্রমিক। আন্দোলন কিন্তু থামানো যায়নি। **১৮৬০** সালের একই দিনে নারী শ্রমিকরা গঠন করে নিজস্ব সংগঠন। সংখ্যায় কম হওয়ার কারণে সে সময় তাদের আন্দোলন সার্বজনীনতা পায়নি আন্দোলনের ফসল গড়ে উঠতে সময় লেগেছিলো।

১৮৮৬ সনের আন্দোলন ছিলো ব্যাপক সম্মিলিত শ্রমিক সমাজের। তাই ১লা মে সকল শ্রমিকের দাবি অর্জন দিবসে পরিণত হয়। ঐতিহাসিক মে দিবস হয়ে উঠে শ্রমিক শ্রেণীর নিকট প্রেরণার উৎস। পৃথিবীর সকল শ্রমিকের সংহতিকে তুলে ধরবার লক্ষ্যেই মে দিবস প্রতিপালিত হয়ে আসছে সেই থেকে। বর্তমানে পুরুষ শ্রমিকদের অবস্থা আর আগের মতো নেই। এখন তারা অনেক অধিকার লাভ করেছে। শুধু আটঘন্টার কাজের স্বীকৃতি নয়, তাদের অন্যান্য মানবিক দাবিও আজ আর কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু নারী আর শিশু শ্রমিকের অবস্থার খুব বেশি উন্নতি হয়নি। এই প্রবন্ধে আমরা শিশু শ্রম নিয়ে খানিকটা আলাপ করবো। ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার লাভ করার ফলে শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া প্রকাশের সুযোগ অনেক প্রশস্ত হয়েছে।

জাতিসংঘের অংগসংগঠন 'আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা' বা ওখঙ বিশ্বব্যাপী শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণে নিয়োজিত আছে। যদিও শ্রমিকরা সেই প্রাগৈতিহাসিক শ্রম-শোষণ থেকে আজো সম্পুর্ণ মুক্ত হতে পারছে না। এখনো নানা ভাবেই তারা তাদের ন্যায পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পহেলা মে এর সাথে নারী শ্রমিকদের আন্দোলনের একটি দিন হচ্ছে ৮ মার্চ, যেটি আজ স্বীকৃতি পেয়েছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে। মানবতার সংগ্রামের ইতিহাসে এটি এক স্বর্ণোজ্জ্বল দিন। এই দিনে তৎকালীন প্রতিবাদী নারীরা বুকের তাজারক্ত দিয়ে মানুষ হিসেবে সমমর্যাদা ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিকে চরম লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। অধিকার আদায়ের এই আন্দোলন ছিল দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতার-ই পরিণতি।

পহেলা মে যত তাড়াতাড়ি স্বীকৃতি পেয়েছে ৮মার্চ তত তাড়াতাড়ি স্বীকৃতি পায়নি ৮মার্চকে নারী দিবস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে অনেক পরে। শোষণ, নিপীড়নের বিরুদ্ধে নারী শ্রমিকদের অব্যাহত আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে **১৯০৮** সালের ৮ মার্চ দৈনিক শ্রমঘন্টা কমানো, মজুরী বৃদ্ধি ও ভোটাধিকারের দাবিতে প্রায় ১৫০০০ নারী আবারো মিছিল বের করেন এবং এক রক্তক্ষয়ী অবস্থার সৃষ্টি হয়। অতঃপর **১৯১০** সালে কোপেনহেগেন অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রদুত জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিন 'আন্তর্জাতিক নারী দিবসের' প্রস্তাব করেন। অধিকার

আদায়ের এই সংগ্রাম বিশ্বমানবতাকে ব্যাপকভাবে নাড়া দেয় এবং ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ৮ মার্চকে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

শিশু শ্রম ও বাংলাদেশ

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সাম্প্রতিক বিশ্ব শ্রম প্রতিবেদন অনুযায়ী এশিয়ায় শিশু শ্রমিকের আধিক্য রয়েছে। এই মহাদেশের কতিপয় দেশের মোট শ্রম শক্তির ১১% হল শিশু শ্রমিক। অপরদিকে আফ্রিকার দেশগুলোতে মোট শ্রম শক্তির ১৭% হলো শিশু শ্রমিক। তৃতীয় বিশ্বে শিশু শ্রমিকের আধিক্য থাকলেও, উন্নত দেশে শিশু শ্রম তিরোহিত হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, ইতালীর নেপল্‌স্ এলাকাতেই শুধুমাত্র চামড়া শিল্পে প্রায় ১০০০ হাজার শিশু শ্রমিক কাজ করে। **১৮৮৬** সালের পহেলা মে রক্তক্ষয়ী অর্জনের মাধ্যমে পুরুষ শ্রমিকরা খানিকটা সস্তি পেলেও নারী ও শিশু শ্রমিকের ভাগ্য যেই তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়েগেছে।

বাংলাদেশের সবচাইতে বড় রপ্তানিমুখী পণ্য হচ্ছে পোষাক শিল্প। এখানে শ্রমিকদের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ নারী ২০ ভাগ শিশু বাকী ১০ ভাগ পুরুষ শ্রমিক। এখানে নারীরা গড়ে ১৪ ঘন্টা পরিশ্রম করে। তাদের পারিশ্রমিকের হার অত্যন্ত কম। কাজের কোন পরিবেশ নেই এমনকি জীবনেরও কোন নিশ্চয়তা নেই। প্রায়ই দুর্ঘটনার শিকার হয়ে নারী ও শিশুরা প্রাণ হারায়। তারা অহরহ যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। কারখানা আসা যাওয়ার পথে নারী শ্রমিকদের প্রায় উত্যক্ত করা হয়। মাঝে মধ্যে মাস্তান, ক্যাডার ও পুলিশের নির্যাতনের শিকার হয় তারা। মালিক পক্ষের পক্ষ থেকে এসব ব্যাপারে কোন প্রকার নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না। চিকিৎসা সেবা অপ্রতুলই নয় বলা যায়, কোন প্রকার চিকিৎসা সেবা নেই। ভবিষ্যত জীবনের জন্যে কোন প্রকার পেনশান বা অন্যকোন সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত এসব নারী ও শিশু শ্রমিকরা।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৬% এর বয়স ১৫ বছরের নিচে। লেবার ফোর্স সার্ভে অনুযায়ী ৫১.২ মিলিয়ন সিভিলিয়ান শ্রম শক্তির মধ্যে ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুর বয়সী শিশুর সংখ্যা ছিল ৫.৮ মিলিয়ন যা মোট সিভিলিয়ান শ্রম শক্তির ১১.৩% । আমাদের দেশে কৃষি কাজেই সর্বাধিক সংখ্যক শিশু করে। এর দু'ভাবে কাজ করে এদের মধ্যে কিছু শিশু তাদের পারিবারিক কাজে সহায়তা করে। অপরদিকে স্বল্পমজুরি, থাকা ও খাওয়ার বিনিময়ে কিছু শিশু তার শ্রম অন্যদের দিয়ে থাকে। অনেক সময় শিশুরা বিনাপারিশ্রমিকেই কাজ করে।

ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ নানা প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়ে বহু দরিদ্র পল্লী পরিবার সর্বস্ব হারিয়ে জীবন ধারণের তাগিদে জীবিকার অন্বেষণে শহরে আসে। এ সব ছিন্নমুল পরিবারের শিশু শহরে কর্মরত শিশু শ্রমিকদের প্রায় ৭০ শতাংশ। এসব পরিবারের মধ্যে ২০% পরিবারে প্রধান হল নিরক্ষর মহিলা। যেখানে আমাদের দেশে মোট ৬০% জনগণ দরিদ্র সীমার নিচে বাস করে সেখানে শিশু শ্রম সমস্যা কি প্রকট আকার ধারণ করতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

দেশ দরিদ্রের কারণে অধিকাংশ শিশু তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। তারা নানাভাবে অবর্ণনীয় উৎপীড়নের শিকার হচ্ছে। অপচয় হচ্ছে ভবিষ্যৎ মানব সম্পদের। শিশু শ্রমিকদের যথেচ্ছা অপব্যবহার প্রতিরোধের ক্ষেত্রে অন্যান্য আর্থসামাজিক কার্যক্রম গ্রহণের সাথে গতিশীল ও উপযুক্ত শ্রম আইনের প্রবর্তন ও প্রচলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ লক্ষ্যে অতীতকাল থেকে আমাদের দেশেও শিশু শ্রমিকদের জন্য কিছু শ্রম আইন প্রণীত হয়েছে। আমাদের দেশে শ্রম আইনগুলো প্রণয়নের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ শ্রম আইনই তদানিন্তন অবিভক্ত বৃটিশ ভারতের প্রণীত। ভারত বিভাগের পর তদানিন্তন পাকিস্তানে আইনগুলো গৃহীত ও অনুসৃত হয়। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশে আমরাও ঐ সমস্ত আইনগুলো গ্রহণ করে কিছু কিছু সংশোধনের মাধ্যমে অনুসরণ করছি।

গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে বিশেষ করে যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার শিল্প কারখানায় উৎপাদন শুরু হওয়ার পর থেকে অবিভক্ত ভারতে শিল্প শ্রমিকদের কর্মঘন্টার সময়সীমা সীমিতকরণ, কাজে পরিবেশ উন্নয়ন, বিশ্রাম ইত্যাদি বিষয়ে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। দারিদ্রপীড়িত শ্রমিকদের স্বল্প বিনিময়ে অমানুষিকভাবে খাটিয়ে নানা অত্যাচার ও নিপীড়নের মাধ্যমে শিল্পপতিরা মুনাফার পাহাড় গড়ে তুলতে থাকে। এতে সচেতন সমাজে দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ফলে তারা নানাভাবে আন্দোলনের মাধ্যম এর প্রতিকারের জন্য সোচ্চার হয়ে উঠতে থাকে। অপরদিকে যে সমস্ত শিল্পপতি ভারতে শিল্প স্থাপন করে তাদের বিরুদ্ধে খোদ প্রভুত্বকারী দেশ বৃটেনের শিল্পতিরা প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠে।

কেননা বৃটিশ ভারতের সস্তায় কাঁচামাল সংগ্রহ এবং শিল্পপতিরা ভারতীয় শ্রমিকদের স্বল্প মজুরি প্রদানের মাধ্যমে দৈনিক ১৬/১৭ ঘন্টা খাটিয়ে তারা বৃটেনস্থ শিল্পপতিদের ব্যবসায়ে অসম প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে। প্রতিযোগিতায় পেরে না উঠায় এক পর্যায়ে **১৮৭৮**ইং সালে মানচেষ্টার চেম্বার অব কর্মাস প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, বৃটিশ কারখানা আইনের বিধান, যা নারী, যুবক এবং শিশু শ্রমিকদের বেলায় প্রযোজ্য, তা ভারতের সুতাকলের বেলায়ও সম্প্রসারিত করা হোক, কেননা তথায় অত্যধিক কর্মঘন্টার প্রচলন রয়েছে।

উপরোক্ত উভয়বিধ কারণে শেষ পর্যন্ত **১৮৮১** সালে ভারতীয় কারখানা আইন (**১৮৮১**ইং সালের ২৫ নং আইন) প্রণীত হয়। এটাই এতদঞ্চলের জন্য সর্বপ্রথম শ্রম আইন যার দ্বারা কারখানা শ্রমিকদের কাজের সীমা ও কার্যব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই আইনই প্রথম ৭ বৎসরের নিচে কোন শিশুকে কারখানায় নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়।

৭ বৎসর থেকে ১২ বৎসর বয়স্কদের শিশু শ্রমিক হিসাবে গণ্য করে তাদের সপ্তাহে ১ দিন ছুটি ও ১ ঘন্টা বিশ্রাম দিয়ে দৈনিক ৯ ঘন্টা কাজের সময়সীমা বিধান এই আইনে রাখা হয়। উল্লেখ্য যে, এই কারখানা আইন যে সমস্ত শিল্পে ১০০ জন বা ততোধিক শ্রমিক নিয়োগ করে যান্ত্রিক শক্তির সাহায্যে উৎপাদন প্রক্রিয়া চলতো উহার বেলাতেই প্রযোজ্য ছিল। **১৮৯০**ইং সালে জার্মানীতে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতীক অধিবেশনের প্রভাবে এবং মানচেস্টারস্থ শিল্পপতিদের চাপের মুখে একই সাথে গঠিত একটি কমিশনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় কারখানা আইন **১৮৯১** (**১৮৯১**ইং সালের ১১ নং আইন) প্রণীত হয়।

যান্ত্রিক শক্তির সাহায্যে পরিচালিত ৫০ জন বা ততোধিক শ্রমিক নিয়োজিত উৎপাদন শিল্পে এই আইন প্রযোজ্য করা হয়। এই আইনে শিশু শ্রমিকদের বয়সের সীমা সর্বনিম্ন ৯ বৎসর এবং সর্বোচ্চ ১৪ করা হয়। তাদের ১ ঘন্টা বিশ্রাম দিয়ে দৈনিক ৭ ঘন্টা কর্মঘন্টা নির্ধারণ করা হয়। ১ দিন সাপ্তাহিক ছুটির বিধানও এতে রাখা হয়।

এরপর **১৯১১** সালে ভারতীয় কারখানা আইন (**১৯১১**ইং সালের ১১ নং আইন) প্রণয়নের মাধ্যমে শিশু শ্রমিকদের দৈনিক কর্মঘন্টা (বস্ত্র শিল্পে) দৈনিক ৬ ঘন্টা নির্ধারণ করা হয়। কিছু আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনের প্রভাবে এবং কিছুটা জাগ্রত সমাজের আন্দোলনের ফলে **১৯২২**ইং সালে ভারতীয় কারখানা (সংশোধিত) আইনের (**১৯২২**ইং সালের ২নং আইন) মাধ্যমে বেশ কিছু বিধানের গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনা হয়। এই আইনের বিধান অনুযায়ী ১২ বৎসর থেকে ১৫ বৎসরের নিচে বয়স্কদের শিশু হিসাবে পরিগণিত করা হয়। তদুপরি এই প্রথম ১৯ বৎসরের কম বয়স্কদের কিছু কিছু বিপজ্জনক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়। **১৯২৬**ইং সালে এক সংশোধনীর মাধ্যমে কোন শিশু শ্রমিককে একই দিনে দুটি কারখানর কাজে নিয়োজিত করা হলে উহার জন্য শিশু শ্রমিকের মাতাপিতার বা অভিভাবক কর্তৃক জরিমানা দেয়ার বিধান সন্নিবেশিত হয়।

১৯৩১ ইং সালে প্রকাশিত রয়েল কমিশন অন লেবার এর রিপোর্টে ভারতীয় কারখানা আইনের সংশোধনের জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হয় যার মধ্যে অন্যতম ছিল (ক) কর্মঘন্টা হ্রাসকরণ, (খ) কর্মপরিবেশের উন্নয়ন এবং (গ) পর্যাপ্ত পরিদর্শন ও আইনের কঠোর বাস্তবায়ন।

উক্ত কমিশনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে পূর্বতন কারখানা আইনসমূহের ব্যাপক সংশোধন ও সুসংহত করার মাধ্যমে **১৯৩৪** সালের কারখানা আইন (**১৯৩৪**ইং সালের আইনে নং ২৫) প্রণীত হয়। এই আইন ১২ বৎসরের নিচে কোন কারখানায় শিশুর নিয়োগ নিষিদ্ধ হয়। এই আইনে শিশু শ্রমিকদের দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (ক) ১২ বৎসর থেকে ১৫ বৎসরের বয়স্কদের শিশু হিসাবে গণ্য করে দৈনিক কাজের কর্মঘন্টার সীমা ৫ ঘন্টা এবং (খ) ১২ বৎসর থেকে ১৭ বৎসর পর্যন্ত বয়স্কদের কিশোর হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে বলা হয় যে, তাদের প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ করা যাবে না যদি সার্টিফায়িং সার্জনের কাছ থেকে এই মর্মে শারীরিক উপযুক্ততার প্রমাণস্বরূপ মেডিক্যাল সার্টিফিকেট সংগ্রহ না করা হয়।

কোন শিশুকে কারখানায় কাজ করতে দেয়া যাবে না যদি তার কাজের উপযুক্ততা সম্পর্কে সার্টিফায়িং সার্জনের নিকট হতে সংগৃহীত না হয় এবং কাজের সময় উক্ত সনদের স্বারকে কোন টোকেন সঙ্গে না রাখে। শিশুদের একই দিনে দুই কারখানায় কাজ করাও নিষিদ্ধ করা হয়। তাদের জন্য বিশ্রামের এক ঘন্টা বিরতিসহ ৭ ঘন্টা পর্যন্ত কর্মব্যাপ্তির সীমা নির্ধারণ করা হয়। এই আইনে কোন শিশুকে কোন কারখানায় সন্ধ্যা ৭টার পর ভোর ৬টা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কাজে নিয়োগ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়।

উল্লেখ্য যে, আই, এল, ও এর ২৩ তম সম্মেলনে রেলওয়ে স্টেশনে ও বন্দরের মাল উঠানো- নামানোর পেশায় ১৫ বৎসরের নিচে কোন শিশুকে নিয়োগ নিষিদ্ধ করে কনভেনশন গৃহীত হয়। এই কনভেশনের ভিত্তিতে এবং রয়েল কমিশন অন লেবারের সুপারিশের প্রেক্ষিতে সর্বপ্রথম শিশু শ্রমিকদের জন্য একক এবং পৃথকভাবে **১৯৩৮**ইং সালে একটি শিশু শ্রমিক নিয়োগ আইন পাস করা হয় (আইন নং ২৬) এই আইন প্রণয়নের একমাত্র উদ্দেশ্য হল ওয়ার্কসপে নিয়োজিত শিশু শ্রমিকদের যথেচ্ছা নিয়োগ ও অপব্যবহার প্রতিরোধ করা। এই আইনের বিধান অনুসারে রেলযোগে মালামাল, যাত্রী এবং ডাক পরিবহন, বন্দরে মালামাল উঠনো- নামানো এবং তদসংক্রান্ত কাজে ১৫ বৎসরের কম বয়সের শিশুদের নিয়োগ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়।

যদিও **১৯৩৭** সালে নুন্যতম বয়স (শিল্পে) সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন কর্তৃক যে পরিবর্তিত কনভেশনের মাধ্যমে রেলওয়ে ও বন্দরের মালামাল উঠানো-নামানো সংক্রান্ত পেশার জন্য শিশু শ্রমিকদের বয়স নুন্যতম ১৩ বৎসর করা হয়। আইনে তা নুন্যতম ১৫ বৎসর রাখা হয় **১৯৩৯**ইং সালে উপরোক্ত এক সংশোধনীর মাধ্যমে শিশু শ্রমিক নিয়োগ (সংশোধন) আইন, (**১৯৩৯**ইং সালের আইন নং ১৫) কতিপয় পেশা যেমন- বিড়ি বানানো, কার্পেট বুনন, সিমেন্ট উৎপাদন, বস্ত্র ছাপানো, রং করা এবং বুনন, দেয়াশেলাই উৎপাদন, বিস্ফোরক দ্রব্য ও আতসবাজী তৈরী করা, অভ্র কাটা এবং পৃথিকীকরণ, গালা উৎপাদন, সাবান উৎপাদন, চামড়া ট্যানিং এবং উল পরিচ্ছন্নকরণ পেশায় ১২ বৎসরপূর্ণ হয়নি এমন শিশুকে নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়। **১৯৫১** সালে আর এক সংশোধনীর মাধ্যমে ১৫ বৎসর থেকে ১৭ বৎসর বয়স্কদের রাত দশটা থেকে সকাল ৭ টার মধ্যে রেলযোগে মালামাল, যাত্রী ও ডাক পরিবহনের কাজে ও বন্দরে মালামাল উঠানো ও নামানোর কাজে নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়।

অতীতে ভারতে বহু জায়গায় শিশুর মাতাপিতা ও অভিভাবক অনেক সময় ঋণ গ্রহন বা অন্য সুবিধা গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাদের শিশুদের শ্রম বন্ধক দেয়ার চুক্তি বা অঙ্গীকারের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তির জায়গায় বা কারখানায় কাজ করার জন্য নিয়োগ করানো হত। পিতামাতার দারিদ্রতার হচ্ছে এর একমাত্র কারণ।

শিশু শ্রম নিরোধকল্পে আই, এল, ও এবং আইপেক আন্তর্জাতিক কর্মসূচির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে ধাপে ধাপে শিশু শ্রম সমস্যা নিরসনের জন্য বিশ্বব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় উদ্যোগ ও কর্মসূচিকে সাহায্য করে এ সমস্যা মোকাবিলায় স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে তোলা, অধিক ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগের অবসান ঘটাতে অগ্রাধিকার দেওয়া ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে আই, এল, ও এবং আইপেক কাজ করছে।

শিশু শ্রম নিরোধকল্পে **১৯৯৪** সালে আইপেক আই, এল, ও এবং শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত এক সমঝোতা স্বারকের আলোকে ২০ সদস্য বিশিষ্ট এক জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয়েছে। এতে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, শ্রম পরিদপ্তর, কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর, আই এল ও, ইউনিসেফ, শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধি রয়েছে। এই কমিটি কর্তৃক **১৯৯৬-৯৭** সালের জন্য কর্মরত শিশুদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, শিশু শ্রম বিলোপ ইত্যাদি সংক্রান্ত ২৩ টি প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

১৯৯৫ সালের জুলাই মাসের ইউনিসেফ, বিজিএমইও এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্বারকের প্রেক্ষিতে পোশাক শিল্পে শিশু শ্রমিক নিয়োগ বন্ধের উদ্দেশ্যে ''চাইল্ড লেবার ভেরিফিকেশন এন্ড মানিটরিং সিস্টেম ইন গার্মেন্টস ফ্যাকটরীজ'' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে বিজিএমইএ, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এবং কলাকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত মনিটরিং টিম কর্তৃক পোশাক শিল্পে শিশু শ্রমিক বিলোপের ক্ষেত্রে অন্যান্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

এই শিল্পে ৯৫% এর অধিক শিশু শ্রমিক নিয়োগ নির্মুল করা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামুলক করা হয়েছে। এজন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু করা হয়েছে। বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে শিক্ষাখাতের প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। পরিবারের শিশুদের কিছু কিছু উপবৃত্তিমুলক শিক্ষদান কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে যদিও প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট নয়।

বাংলাদেশে শিশু শ্রম সমস্যা এত ব্যাপক যে রাতারাতি এর সমাধান সম্ভব নয়। তবে প্রাথমিকভাবে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে বিপজ্জনক শিল্পে শিশু শ্রম বর্জনের লক্ষ্যে যথাশ্রীঘ্র সম্ভব সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসতে হবে। সার্বিকভাবে শিশু শ্রম অবসানের লক্ষ্যে সরকারি কর্তৃপক্ষ, বেসরকারি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাসমূহ কর্তৃক সমন্বিতভাবে দীর্ঘমেয়াদী ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। শিশু শ্রম নিরোধের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে চেতানবোধ জাগিয়ে তোলা।

গৃহ ভৃত্য হিসাবে শিশুদের নিয়োগ এবং তাদের ওপর অত্যাচার আজ এমন এক পর্যায়ে এসেছে। অনেক বিবেকবান মানুষ গৃহস্থালী কাজে শিশুদের নিয়োগ সম্পুর্ণ ভাবে রহিত করার জন্যে নতুন আইন প্রনয়নের কথা বলছেন।

নারী পরুষ উভয় শ্রেণীর শ্রমিকদের সংগ্রামের ফলেই রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছিলো, ক্রমে একটি শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিবিরেরও অভ্যুদয় ঘটেছিলো। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের পরিচালকদের নানা ভুল ভ্রান্তির ফলে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এসে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ অনেক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতন ঘটেছে। পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ধনতান্ত্রিক দেশসমূহেও শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থায় উন্নয়নের পথ খুলে গিয়েছিলো। মালিক শ্রেণী শ্রমিকদের ন্যার্য অধিকার পুরোপুরি অস্বীকার করার সাহস পেতো না। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর এদিকটায় নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, শ্রমিকদের সেই নৈতিক শক্তিতে এখন অনেক ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

এ অবস্থায় ঐতিহসাকি মে দিবস নতুন তাৎপর্য নিয়ে দেখা দিয়েছে। এই দিবস থেকে এখন শ্রমিকদের নতুনতর প্রেরণা আহরণ করতে হবে। কোনো অন্যায় অবিচারই যে চিরস্থায়ী হয়ে থাকতে পারে না,- শ্রমিকদের এ বিষয়টি সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করতে হবে। যুগ যুগের পুঞ্জীভূত অত্যাচারের পরও থেমে নেই মানুষ ও মানবতার মুক্তির প্রয়াস। **১৯১০** সালে আমেরিকার নিউয়র্ক শহরের জ্বলে উঠা একদল জীবনবাদী নারী ও **১৮৮৬** সালের শিকাগোর হে মার্কেটের সাহসী শ্রমিকদের পথ ধরে সারাবিশ্বের শ্রমিক সমাজ আজো শ্রম শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার সবধরনের শোষণের অবসান ঘটিয়ে সারা পৃথিবীতে এক সাম্যমূলক সমাজ গঠনের জন্য শ্রমিকদেরই এগিয়ে আসতে হবে।

এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের শ্রমিকদের দায়িত্ব ও কম নয়। বাংলাদেশেল স্বাধীনতার পরই দেশের শ্রমিকরা মে দিবস পালনের রাষ্ট্র স্বীকৃত অধিকার লাভ করে। স্বাধীনতা সংগ্রামেও শ্রমিকদের অবদান ছিল অনেক। সেই শ্রমিকদেরই দেশের স্বাধীনতাকে সংহত করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। মেহনতী মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠা না হলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে না।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য শ্রমিক শ্রেণীকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। সেই সঙ্গে কৃষকসহ সকল মেহনতী মানুষকে ও বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীকেও শ্রমিকদে প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। প্রতিবছর ঐতিহাসিক মে দিবস পৃথিবীর সকল মেহনতি মানুষের সাথে বাংলাদেশের জনগণকে এই সব দায়িত্বের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। মে দিবসের চেতনায় সকল শ্রমজীবী মানুষ একাত্ব হয়ে একদিন শোষণমুক্ত সমাজ গড়বেই। মে দিবস অমর হোক।

***

মে দিবস

এ. এফ. এম ফতেউল বারী রাজা

পহেলা মে ইউরোপ ভূখন্ডে এক সময় প্রাণের হিল্লোলে, মহা উল্লাসে, অনাবিল আনন্দ ঘন উচ্ছ্বাসে, পরম উৎসব মুখর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হতো। মে বৃক্ষ রোপণ করে তাকে সাজানো হতো মনোরম পুষ্প সম্ভারে, চিত্তাকর্ষক দৃষ্টি নন্দন বর্ণীল আয়োজনে। মে রাণীর কল্পনায় কবিরা শব্দালঙ্কারের অনুপম গাঁথুনিতে বাণী বন্ধ করে লিখতেন কত সুন্দর সুন্দর কবিতা। রাজা-রাণী হতে আপামর জনসাধারণ বাঁশির সুমধুর সুরে, বাদন যন্ত্রের তালে তালে মেতে উঠতেন নাচে গানে।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দির শেষ ভাগে এসে পহেলা মে হারিয়ে ফেলল তার কালের ঐতিহ্যমন্ডিত পূর্ববর্তী আনন্দ উৎসবের আনুষ্ঠানিক ধারা। তাই পহেলা মে নতুনভাবে তাৎপর্যমন্ডিত হয়ে আবির্ভূত হলো বিশ্ববাসীর কাছে। এই পরিবর্তনের ঐতিহাসিক পেক্ষাপট পর্যালোচনা করতে গেলেই শুরুতেই এসে যায় পুজিবাদ শাসকবর্গের পৈশাচিকতার নিষ্ঠুর আচরণ ও উৎপীরণের কথা। এরপর অসহায় শ্রমিক শ্রেণীর রক্তাক্ত ইতিহাস ও ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয় গান গেয়ে মহান আত্মোৎসর্গের নজীর বিহীন দৃষ্টান্তের কথা।

কলকারখানার উন্নতির সাথে সাথে শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টি হওয়ার ফলশ্রুতিতে, ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমিকদের শোষণ করে পুঁজিপতিরা সম্পদের বিশাল পাহাড় গড়তে লাগল। অপর দিকে শ্রমিক হতে থাকল নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর। মালিক পক্ষ বিভিন্ন অত্যাচার এবং উৎপীড়ণের মাধ্যমে কলকারখানায় দিনের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আঠারো থেকে কুড়ি ঘন্টা কাজ করিয়ে নিত। সূর্যোদয়ের পুর্বে কর্মস্থলে যাওয়া আর ক্লান্ত অবসাদ দেহে সূর্যাস্তের অনেক পরে গৃহে ফিরে আসা ছিল নিত্য নৈমত্তিক ব্যাপার। এত পরিশ্রম করার পরও পেতনা কোনো উদ্বৃত মুল্য। ফলে সামান্য মজুরীতে শ্রমিকদের অন্নের সংস্থান হতো না।

এহেন পরিস্থিতিতে ১৬৮৪ সালে ঠেলাগাড়িওয়ালাদের সংগঠন, ১৭৭০ সালে পিপা প্রস্তুতকারদের সংগঠন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সোচ্চার হয়ে উঠে। ১৭৮০ সালে আমেরিকা বৃটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। ১৮২৩ সালে নিউইয়র্কের মহিলা দর্জিরা কাজের সময় হ্রাসের জন্য ধর্মঘট করে। ১৮২৭ সালে ১৫টি শ্রমিক ইউনিয়ন নিয়ে প্রথম গঠিত হয় শ্রমিক ফেডারেশন, ফিলাডেলফিয়ার মেকানিকদের ইউনিয়ন।

১৮২৮ সালে শিশু কারখানার শ্রমিকদের প্রথম ধর্মঘট ও বিভিন্ন কর্মসুচী সারাবিশ্বে এই ধারণা জন্মায় যে, শ্রমিকরা খুব শিগ্রই এক সংগঠিত শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে আন্দোলনের ক্রমউন্নতির এক পর্যায়ে নিউইয়র্কের রুটির কারখানার খেটে খাওয়া শ্রমিকরা দাবি করে বসল, তারা ১০ ঘন্টার বেশি কাজ করবে না। তাই ধর্মঘট করল। ১৮৩৭ সালে অগত্যা মার্কিন সরকার তাদের দাবির কাছে হারমানল, বেঁধেদিল কাজের জন্য ১০ ঘন্টা সময়। এর পর রাজনীতি দ্রুত বদলাতে লাগল। প্রগতিশীলতার সঙ্গে মধ্যযুগীয় সামাজিক মুল্যবোধের ঠোকাঠুকির কারণে ইউরোপে রাজতন্ত্র গুলো ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ল। শেষে রাজতন্ত্রের পতন ঘটল। কিন্তু রাষ্ট্র ভাঙ্গালোনা। শ্রমজীবিদের কল্যাণে টিকে থাকল। তাই মার্কস ও এঙ্গেল লক্ষ্য করলেন রাষ্ট্রের প্রধান শক্তি শ্রমিকদের হাতে।

কারন তারাই অর্থনীতির চালিকা শক্তি। তারা যৌক্তিকতার সাথে দেখালেন ভঙ্গুর রাজতন্ত্র ও চেতনাহীন পুঁজির মালিকরা রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে পারবেনা। পারলে শ্রমিকরাই পারবে। তাদের মাধ্যেমেই উৎপাদন ব্যবস্থাকেও বদলে দেওয়া যাবে। তাই ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টুতে তাঁরা শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন উৎপীড়ক পুঁজিবাদের রক্ষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য।

১৮৬৪ সালে বৃটেনে প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমজীবীদের সমিতি গঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলন নতুন মোড় নেয়। এই সমিতি মালিক পক্ষের শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে শ্রমিক আন্দোলনকে আরো বেগবান করতে সহায়তা করে। দু' বছর পর ১৮৬৬ সালের আগস্ট মাসে বাল্টিমোরে ৬০টি শ্রমিক ইউনিয়ন মিলে ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়নের নেতৃত্বে গঠন করে ''আট ঘন্টা শ্রম সমিতি'' এবং সমিতির পক্ষ থেকে ঘোষণা করে ১৮৮৬ সালের ১ মে থেকে ৮ ঘন্টা শ্রম বিধান কার্যকর করতে হবে ।

ফলে এই সমিতি সারা বিশ্বে প্রচন্ড জনপ্রিয়তা অর্জন করল। তাছাড়া আমেরিকার আইন সভাও এই সমিতিকে অনুমোদন দিল। ১৮৭১ সালে ফ্রান্সে প্রথম শ্রমিক শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। প্যারিস কমিউন মাত্র ৭২ দিন টিকে থাকলেও শ্রমিক বিপ্লবের ইতিহাসে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। ১৮৭৫ সালে মালিক ও সরকার পক্ষ যৌথভাবে পাষন্ডের মত নির্মমতার সাথে ১০ জন শ্রমিককে ফাঁসিকাস্টে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ড দেয়। রোষানলে জ্বলে উঠলো সমগ্র বিশ্বের শ্রমিককুল। চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হলো বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলন।

১৮৭৭ সালে এই ফাঁসির কারণে লাখ লাখ রেল ও খনি শ্রমিক ধর্মঘটের ডাক দেয়। এ ধর্মঘটের ফলে প্রাণ দিতে হয় তিন শত শ্রমিককে। শ্রমিকদের এই আত্মত্যাগে শ্রমিক আন্দোলন নবতর পর্যায়ে উন্নীত হয়। শ্রমিক পক্ষ লক্ষ্য করল, মালিক পক্ষের সাথে সরকার পক্ষ যুক্ত হয়েছে এবং উভয় পক্ষের স্বার্থ একই সূত্রে গাঁথা। সুতরাং দু' পক্ষের বিরুদ্ধেই আন্দোলনের পর আন্দোলন চলতে লাগল।

১৮৮৪ সালের ৭ অক্টোবর আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার ঘোষণা দেয়, ''১৮৮৬ সালে পহেলা মে থেকে ৮ ঘন্টা কাজের সময় গণ্য করা হবে।'' অর্থাৎ কোন শ্রমিক দিনে ৮ ঘন্টার বেশি কাজ করবে না। ফেডারেশনের এই ঘোষণাকে কার্যকর করার জন্যই ৮ ঘন্টা কাজের দাবিতে শ্রমিকরা ধর্মঘটের ডাক দেয়। ধর্মঘটে অংশগ্রহণের জন্য ৫ লক্ষ শ্রমিক কারখানা থেকে দলে দলে বেরিয়ে এসে জমায়েত হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিওনয়িস অঙ্গরাজ্যের শিকাগো শহরের মিশিগান এ্যাভিনিউতে হে মার্কেট স্কোয়ারে। রচনা হলো সংহতির এক প্রোজ্জল উদাহরণ।

আন্দোলন ঠেকাতে নামানো হল সেনাবাহিনী এবং পুলিশ। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে শ্রমিকরা মিছিল বের করলে মিছিলের উপর চালানো হল হামলা। নির্বিচারে গুলি করে চালাল হত্যা যজ্ঞ। ৩ মে পুলিশী হামলায় নিহত হল ৬ জন। পরের দিন হে মার্কেট স্কোয়ারে সমবেত প্রতিবাদ সভায় পুলিশ গুলি চালালে শ্রমিকের তাঁজা বুকের রক্তে রঞ্জিত হল হাতের নিশান। চার শ্রমিক নেতা স্পাইজ, পর্সনস, ফিসার ও এঞ্জেসকে করা হয় বন্দী এবং বিচারে দেওয়া হল প্রাণদন্ড।

এ অবিচারের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত সোচ্চার হয়ে ওঠে। শ্রমিক আন্দোলনের এই আত্মত্যাগকে চির স্বরণীয় করে রাখার জন্য ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই প্যারিসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সোসালিস্ট লেবার ইন্টারন্যাশনাল সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় পহেলা মে কে ১৮৯০সাল থেকে প্রতিবছর দুনিয়ার মেহনতী মানুষের সংহতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার দিবস তথা মে দিবস হিসাবে পালন করা হবে।

সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৮৯০ সালে প্রথম গ্রেট ব্রিটেনের হাইড পার্কে সমবেত লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের সভায় মে দিবস পালিত হয়। ফ্রান্সে সংগঠিত হয় মে দিবসের মিছিল। পরে রাশিয়া, চীন, জার্মানিতে মে দিবস অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ১৯২৩ সালে ভারতের মাদ্রাজে কমিউনিস্ট আন্দোলনের হোতা সিঙ্গাভেলু চেটিয়ার উদ্যোগে মে দিবসের সূচনা হয়। আমাদের বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে মে দিবস পালিত হয়। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বের মেহনতী শ্রমিক শ্রেণী, শ্রমিকের এ সংগ্রাম, সংহতি ও সৌভ্রাতৃত্বের প্রতীক ১ মে কে পালন করে দুনিয়ার মেহনতী মানুষের সংহতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার দিবস তথা মে দিবস হিসাবে।

আমাদের দেশে ভাষা শহীদের প্রথম রক্ত যেথায় ঝরেছে তথায় বার বার পাকিস্তানী শাসক ও শোষক চক্র শহীদ মিনার ভাঙ্গার পরও শহীদের স্মৃতিচিহ্ন শহীদ মিনার প্রতিষ্ঠা করেছি। কিন্তু পুঁজিবাদরা তাদের কলঙ্ক ঢাকার জন্য শিকাগোর হে মার্কেটের নাম নিশানাও রাখেনি। তবে মেহনতী মানুষের হৃদয়ের ক্ষতের দাগ মুছতে পারেনি। তাই মে দিবস তাদের স্মরণ করিয়ে দেয় শ্রেণী বৈষম্যের অবসানের লক্ষ্যে সংকল্পবদ্ধ ও সংগঠিত হবার কথা। প্রেরণা যোগায় মালিক শ্রেণীর শোষণ- বঞ্চণা অত্যাচার-অবিচার, নিপীড়ণ-নির্যাতন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ বৃহত্তর সংগ্রামের অঙ্গীকারের কথা এই বলে, **''দুনিয়ার মজদুর এক হও।''**

তাই এই দিনে দুনিয়ার মেহনতী শ্রমিক শ্রেণী রক্ত রঞ্জিত লাল ঝান্ডার নীচে দাঁড়িয়ে আপোষহীন সংগ্রামের শপথ গ্রহণ করে এবং শোষণের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির স্বপ্ন দেখে।

অতএব, মে দিবস বিশ্বের সকল শ্রমিকের সংহতি প্রকাশ ও সংকল্পবদ্ধ হবার দিবস। মে দিবস মালিকের শোষণ-বঞ্চনা, অত্যাচার-অবিচার, নিপীড়ণ-নির্যাতন ও উৎপীরণ থেকে মুক্তির স্বপক্ষে অঙ্গীকারাবদ্ধ হবার দিবস। মে দিবস দুনিয়ার মেহনতী শ্রমিকের মানসপটের হৃদয় আকাশে জেগে থাকা অভ্রান্ত ধ্রুব তারার মত সংগ্রামী জীবনের দিক নির্দেশক। মে দিবস বিশ্বের মেহনতী শ্রমিকের শ্রেণী-বৈষম্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ দাসত্ব থেকে মুক্তির পথ প্রদর্শক।

***

মে দিবসের কবিতা

আনোয়ারের রক্তমাখা সার্ট ও বিদ্রোহী কানসাট

প্রকৌঃ মোঃ দেলোয়ার হোসেন

আজ ভোরে পত্রিকার পাতায় দেখলাম এক জননীর রক্তভেজা নিসাড় শরীর
হত আজ আনোয়ার, স্তব্দ কানসাট জননীর হাতে রক্ত ভেজা সার্ট সন্তানের
চাষের বিদ্যুৎ নেই, দাবী তোলার অধিকার নেই, আছে শুধু তপ্ত বুলেট ঘাতকের
বিশ স্বজনের বুলেট বিধ্ব লাশ পড়ে আছে রাস্তায়, পাশে পুলিশ মাথায় হেলমেট
আনোয়ার, চেনেনি মানুষরূপী ঘাতকদের জাতে যারা হাতে ধরা বেয়নেট
বর্বর লুটেরা, খুনী, অনেক কথাই উচ্চারিত হয়, তবে কোনটাই ওদের জন্যে সম্পূর্ণ নয়

ভয় নাই বন্ধু, আমরাও এসেছি লড়াই জমবে, হবে প্রতিরোধ, শেষ হবে আরোপিত যুদ্ধ,
ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে, নাচোল, শিকাগোর পথ ধরে জয়ী হবে বীর কানসাট
ঘাতকের বুলেট খুলে দিয়েছে ইতিহাসের পাতা জনতার বুকে এখন শুধুই রুদ্ররোষ
আনোয়ার মৃত্যুতে তুমি মহিয়ান, আর একজন আনোয়ার আছে জীবিত কিন্তু জানোয়ার
কানসাটে আজ ফুটেছে শত মাধবী হাস্নাহেনা, বকুল ওরা মায়ের বিপ্লবী আনোয়ার
আমিও আজ তোমাদের মিছিলে তোমাদের দাবীর সর্মথনে ছুটে এসেছি দৃপ্ত পায়

আগুন জ্বলছে চারদিকে, আগুন নয় জয়ের আলো, রাতের বিবর থেকে বেরিয়েছে আলো
আমি যুদ্ধজয়ী ক্লান্ত এক মুক্তিসেনা, নতুন প্রজন্মের আহ্বান শুনে এসেছি জয়ের বাসনায়
আমি আনন্দিত আজ, ফেলে আসা দিনগুলোর সাহসী সময়, উৎসর্গ করে তোমাদের তরে
আনোয়ার আজন্ম বেঁচে থাকতে চাই তোমাদের মাঝে, যোগ দিতে চাই বিদ্রোহী রণে
ক্লান্ত আমি, আমার অবয়বে ক্লান্তির রেখা, তবুও তোমাদের খুঁজবো বিদ্রোহী জনারণ্যে
পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সাগর সৈকত বালুচর সবাই ব্যাকুল, তোমাকে জানাতে অভিবাদন
আমি শপথবাক্য উচ্চারণ করে ছুটে এসেছি, অনুপ্রেরণা আমার আনোয়ারের রক্তমাখা সার্ট
আন্দোলিত রক্তাক্ত কানসাট, উদ্বেলিত করেছে আমাকে, আসন্ন বিপ্লবের নতুন কাবা কানসাট

ঘাতকের বুলেট আজ প্রতিহত হয়েছে, তুমি অনন্য, ধন্য আনোয়ার, আর বিপ্লবী কানসাট
দেখেছি শত সহস্র গোলামরাব্বানী উষ্ণীষহীন, হাতে খোলা তলওয়ার, বিদ্রোহী জনতার সম্রাট
ওদের ঝরা রক্ত ঘামে বায়ু মন্ডল আজ ভারী, নভোমন্ডলে বিদ্যুৎ কণা অপার শক্তির আধার
আমার অভিশাপ, লুটেরা খুনী ঘাতকের দল নিপাত যাক, ধ্বংস হোক, জয় হোক জনতার
বজ্র বর্ষিত হোক ঘাতকের মস্তকে, বীরজনতার কানসাট গর্জে ওঠুক বার বার, হোক অমর
কানসাটের বিশ স্বজন তোমরা হয়েছ আজ নীহারিকাপুঞ্জ, ওখানে চির আবাস হোক আমার
আরক্তনেত্র মায়ের হাতে রক্তমাখা সার্ট, হোক জয়ের ঝান্ডা সকল যুদ্ধে সংগ্রামী মুক্তিসেনার।

ড. মশিউর রহমান এর কবিতা

এক ধর্ষিতা নারীর কথা

(১)

কেমন আছেন? আমাগো কবি সাহেব,
গলায় সোনার ম্যাডেলটা ঝুলাইয়া
বেশতো দেখি ভালাই আছেন।
গেল বছর আপনে আমারে নিয়া
কিজানি কবিতা লিখলেন,
অসীম কাব্য প্রতিভা আপনার, আপনার কলমের খোঁচায়
খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে লিখলেন আমার কথা।

আপনাদের পুরুষ সমাজে
আমি তো কিছুই চাইনি,
তবু কেন মাঝরাতে পাটক্ষেতে ক্ষতবিক্ষত করে
আপনারা যে কী মজা পেলেন?
জেলখানায় নালিশ নিয়ে গেলে,
তারা আমাকে হাজতে রাখলেন,
মাঝরাতে সেপাই ডেকে নিয়ে গেল,
পরের দিনও, তারপরের দিনও
আমি চুপ করে আপনাগো তামাসা দেখলাম।
পরে আমারে বাহির করে নিয়ে এল, নারীবাদী নেত্রীরা,
বিশাল গাড়িতে আমাকে নিয়ে এল, প্রেসক্লাবে।
অনেক কথা হলো,
আমি কেবল শুনলাম আপনাগো তামাসার কথা
বাড়ি ফিরে এলে আবার ছবি তুলবার জন্য তেনারা এলেন,
ছবি তুলব ভাইব্যা-ভাল দেইখ্যা একটা শাড়ি নিয়া আইলাম
এলিজার মার থাইক্যা, তা আপনারা বল্লেন-সেই শাড়িটাই নাকি পরতে হবে।
একটি নারী হয়ে ক্যামন করে সেই শাড়িটা আবার পরি, বলতে পারেন?
ছোপ ছোপ রক্তের ছাপ আপনাদের যৌনক্ষুধা মিটালেও,
আমারে তা যাঁতার লাহান প্যাষণ করে।
আপনি কবি মানুষ। আমার কবিতা লেইখ্যা আপনে মেডেল পাইছেন,
তাই ভাবলাম, আপনে বুঝবেন আমার মনের কথা।

(২)

মানবতা নাকি জানি বলে. সেই প্রতিষ্ঠানের লোকজন এল,
আমারে নাকি অনেক টাকা দিবে আমার সতিত্বের মুল্য,
কিন্তু কোই কোন শালাই তো আর আমারে বিয়া করবার চায় না
সবাই আড়চোখে তাকায়
গতবছর মহব্বত মিস্ত্রি আমারে কথা দিয়েছিল,
সামনের বছরেই তোকে ঘরে তুলবো,
সেই মহব্বতও আমারে এখন চিনবার পায় না
তেনারা পাঁচশ টাকার নোট আমার হাতে দিয়ে

সতিত্বের মুল্য দিল,
পরের দিন কাগজে উঠলো একলাখ টাকার কথা,
আমি মেট্রিক পাশ দিবার পারি নাই,
তাই আপনাগো অংক মিলাইবার পারিনা।

কিন্তু উকিলকে টাকা না দিলে কেস চলেনা,
সেই উকিলও আমাকে একরাতে আসতে বললেন,
আবার আপনাগো তামাসা দ্যাখতে হল।
আপনে তো আমারে নিয়া কবিতা লিইখ্যা
বড় বড় কাগজে ছাপেন ও বক্তিতা দিয়া বেড়ান,
তা কবি সাহেব বলতে পারেন,
কবে আপনাগো তামাসা বন্ধ হবে?
ধর্ষিত হয়েছিলাম আমি একদিন পাটক্ষেতে,
কিন্তু এখন প্রতিদিনইতো ধর্ষিত হচ্ছি আমি, প্রতিদিন....
ওকাজাকি
১৭অক্টোবর২০০২ইং

অরপি আহমেদ এর তিনটি কবিতা

একজন রাজাকার পিটানোর আশায়

আমার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীন একটি দেশের জন্য
দীর্ঘ প্রায় দশটি মাস তিনি তাঁর স্ত্রী ছেলে মেয়েকে ছেড়ে
চলে গিয়েছিলেন যুদ্ধ করে একটি স্বাধীন দেশের জন্ম দিতে।
আমার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা, একজন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার। এই
অপরাধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী, তাদের দোসর
রাজাকার আলবদর বাহিনী বোমার আঘাতে
আমাদের ঘরবাড়ি সব ভেঙ্গে দিয়েছিল। দীর্ঘ প্রায় নয়টি মাস
আমার মা ভাইবোন মানুষের বাড়িতে বাড়িতে
পালিয়ে পালিয়ে না খেয়ে দিন কাটিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস
বাবাকে কাছে না পেয়ে, বাড়ি ঘর হারিয়ে মানুষের
বাড়িতে বাড়িতে যাযাবরের মত দিন কাটিয়ে বাবার কাছ থেকে
আসা মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছে আমাদের পরিবার,
আমাদের গ্রামের মানুষ। জয় বাংলা স্লোগানে মুখরিত করে তুলেছিল
আমাদের গ্রামের আকাশ বাতাস। মুক্তিবাহিনীর থাকা খাবার ব্যবস্থা করেছে,
মুক্তিযোদ্ধাদেরকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং রাজাকার আলবদর বাহিনীর
বিরুদ্ধে মুখোমুখি যুদ্ধে সহযোগিতা করেছে। এবং এই করেই
আমাদের গৌরবের মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস কাটিয়েছে
আমাদের পরিবার এবং আমাদের গ্রামের মানুষ।

অবশেষে দীর্ঘ নয়মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর দেশ স্বাধীন হল।
একটি স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হল। একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন পতাকা হল।
একটি জাতি, বাঙালি জাতি তার জাতিস্বত্ব পেল। একটি জাতি
একটি ভাষা পেল, বাংলা ভাষা। আমার বাবা এবং
তাঁর মতো আরো লাখো মুক্তিযোদ্ধার রক্তের বিনিময়ে,
কষ্টের বিনিময়ে অগণিত মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে পাওয়া একটি স্বাধীন দেশে
আমি নিঃশ্বাস নিয়ে বড় হয়ে উঠলাম।
একজন মুক্তিযোদ্ধা হয়ে
আমার বাবা গর্ব বোধ করে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে
যুদ্ধ করে বাবা আমার গর্ব বোধ করে। রাজাকার আলবদর বাহিনীর বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করে একটি স্বাধীন দেশের জন্ম দিয়ে আমার বাবা
গর্ববোধ করে। একটি স্বাধীন পতাকা পেয়ে আমার বাবা গর্ব
বোধ করে। আমাদেরকে একটি ভাষা, বাংলা নামের একটি ভাষা
দিতে পেরে আমার বাবা গর্ববোধ করে। একটি স্বাধীন দেশে
স্বাধীনভাবে আমাদেরকে বড় হতে দেখে আমার বাবা গর্ববোধ করে।

স্বাধীনতার পঁয়ত্রিশ বছর পার হয়ে যায়। আমার বাবার বয়স
প্রায় নব্বই হয়। এই বয়সে আমার বাবা বারে বারে দুঃখিত হয়। বলেন–
যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এই স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছিলাম সেই
স্বাধীন বাংলাদেশে রাজাকার আলবদর বাহিনী আবার

তাদের হায়েনার দৃষ্টি মেলে ধরেছে। বাবাদের যুদ্ধ করে
অর্জিত স্বাধীন সোনার বাংলাদেশে আবার হায়েনার দৃষ্টি পড়েছে।
আবার দেশ বিরোধীরা
খাবলে ধরেছে সোনার বাংলার গলা।
বাংলাদেশের ক্ষমতায় বসেছে রাজাকার আলবদর। বাবার কষ্ট বেড়ে
যায়। বাবা বলেন, যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে একটি স্বাধীন পতাকা
বানিয়েছি, সেই পতাকা বাহিত গাড়িতে চড়ে রাজাকার আলবদর বাহিনী আজ
স্বাধীন বাংলাদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাবার কষ্ট হয় যখন তিনি দেখেন তাঁর মত
অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা অবহেলায় অনাদরে বিনা চিকিৎসায় না খেয়ে
মরে যায় তাদেরই রক্তে বানানো এই সোনার বাংলায়। তিনি আমার দিকে
আঙ্গুল তুলে বলেন, তোমাদেরকে একটি দেশ দিয়েছিলাম। যাদের বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করে এই দেশটি তোমাদেরকে ছিনিয়ে এনে দিয়েছিলাম সেই দেশে এখন
রাজাকার আলবদরেরা রাজত্ব করে। তুমি কি লজ্জা পাওনা। তুমি কি তোমার
মুক্তিযোদ্ধা বাবাকে লজ্জিত করনা? বাবা বলেন, তোমাকে একটি পতাকা
এনে দিয়েছিলাম, একটি ভাষা এনে দিয়েছিলাম।
যারা সেই পতাকা, সেই ভাষার বিরোধিতা করেছিল তোমার চোখের সামনে
তারা এখন তোমার স্বাধীন দেশে রাজত্ব করে বেড়ায়। তোমার কি লজ্জা হয়না
একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হয়ে তুমি
এইরকম এক মেরুদন্ডহীন হলে কীভাবে?
বাবা আমার বয়সের ভারে নুয়ে নুয়ে চলে। ঠিকমত কোনকিছু মনে রাখতে পারে না।
কিন্তু দেশ, পতাকা, ভাষা, স্বাধীনতার কথা ভুলতে পারে না। দীর্ঘ নয়মাসের
রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের কথা ভুলতে পারেন না। পকেট থেকে একটি চিঠি বের করে
গর্ব করে বলে, দেখ বঙ্গবন্ধুর চিঠি।
বঙ্গবন্ধু লিখেছেন-প্রিয় জালাল দেশ স্বাধীন করতে হবে।
বঙ্গবন্ধুর সেই চিঠি পেয়ে তোমাদের সবাইকে ছেড়ে
তোমাদের জন্য একটি স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নে শত্রুর বিরুদ্ধে
সম্মুখ যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিলাম। দেশ স্বাধীন করেছিলাম। সেই স্বাধীন
দেশের মুক্ত হাওয়ায় বেড়ে উঠা এই তুমি।
একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান এই তুমি। তোমারই চোখের
সামনে আবার সেই হায়েনারা ক্ষমতায় বসেছে
বাংলাদেশের পতাকাকে কামড়ে ধরেছে।
তোমার কি লজ্জা হয় না!? একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হয়ে তুমি কি পার না
একজন রাজাকারকে পিটাতে। বঙ্গবন্ধুর মত এই স্বাধীন বাংলাদেশে কি
কোন নেতা তৈরী হয়নি যে তোমাদেরকে এইসব রাজাকারদেরকে পিটাবার
জন্য একটি চিঠি লিখবে? তোমাদের কি লজ্জা হয় না এইভাবে রাজাকারের
অধিনস্থ হয়ে বসবাস করতে? একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হয়ে
তোমার রক্ত এমন কাপুরুষের রক্তে কেন পরিণত হল?
লজ্জা হয় না তোমার? তোমাদের লজ্জা হয় না কেন?

স্বাধীনতার পঁয়ত্রিশ বছর চলে যায়। বাবার কথায় আমার
মাথা নিচু হয়। আমি লজ্জা পাই।
লজ্জায় অপমানে চোখ দিয়ে পানি পড়ে। আমি এক মেরুদন্ডহীন প্রাণী।
আমার গর্ব করার মত কিছু নেই। আমি আমার মুক্তিযোদ্ধা

বাবাকে লজ্জায় ফেলি বার বার। বাবা ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে
তাকায়! আমি লজ্জিত হই। গুমরে উঠে আমার ভিতর বাহির। আমার
এই লজ্জা আমি রাখি কোথায়? আমার বাবার দেয়া
স্বাধীন বাংলাদেশে রাজাকার আল বদরের রাজত্ব চলে। আমি কিছু
করতে পারি না, এই লজ্জা আমি ঢাকতে পারি না। একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার
সন্তান হয়ে আমারই চোখের সামনে রাজাকারেরা স্বাধীন বাংলার পতাকাবাহীত
গাড়িতে চড়ে ঘুরে বেড়ায়, এই লজ্জার কথা আমি কার কাছে বলি?
স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধারা না খেয়ে, বিনা চিকিৎসায় ধুঁকে ধুঁকে মরে।
এই লজ্জা আমি রাখি কোথায়? যুদ্ধের নয়টি মাস বাবা আমার
হানাদার বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেছে। পাক রাজাকার আল বদর
মেরেছে। স্বাধীন বাংলাদেশের পঁয়ত্রিশ বছর পার হয়ে যায়। এই এতগুলো দিনে
এই আমি বাবা দেয়া একটি স্বাধীন
দেশে বড় হয়ে, একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হয়ে আমি
একজন রাজাকারকে পিটাতে পারলাম না
এই লজ্জা আমি রাখি কোথায়।
আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার সাথে চলাফেরা করি।
যখনই আমি তাঁর সামনে পড়ি
নিজের কাছেই বারে বারে ছোট হয়ে যাই।
তাঁর চোখে তাকাতে পারি না।
কখনও যদি তাঁর চোখে চোখ পড়ে মনে হয় তিনি বলছেন,
তোমার কি লজ্জা হয়না? আর কি চাও আমাদের কাছে?
যুদ্ধ করে তোমাদেরকে একটি স্বাধীন দেশ দিয়েছিলাম। একটি পতাকা দিয়েছি,
একটি ভাষা দিয়েছি। কত রাজাকার আলবদরকে মেরে
এই দেশ স্বাধীন করে তোমাদের উপযুক্ত করে তোমাদের হাতে তুলে
দিয়েছিলাম। কি করেছ তোমরা. কি করেছ তোমরা আমাদের রক্তে অর্জিত
এই স্বাধীন বাংলাদেশকে?
স্বাধীনতার এই পঁয়ত্রিশ বছরে তোমরা আবার বাংলাদেশের মসনদে রাজাকার
আলবদরদের বসিয়েছ! যেখানে রাজাকারদের পিটায়ে দেশ ছাড়া করার কথাছিল
তোমাদের। সেখানে তোমরা তাদেরই হাতে আমাদের রক্তে অর্জিত
স্বাধীনতার পতাকা তুলে দিয়েছ!
লজ্জা করে না তোমাদের?

আমি লজ্জায় নত হই। আমার দুচোখ বেয়ে জল ঝরে পড়ে।
আমি আমার লজ্জা ঢাকার কোন জায়গা খুঁজে পাই না।
আমার বাবার দেয়া এই স্বাধীন বাংলাদেশকে আমি রক্ষা করতে পারছি না।
আমারই চোখের সামনে রাজাকার আলবদরেরা আমার বাবার রক্তে অর্জিত,
কষ্টে অর্জিত বাংলাদেশে রাজ করে। আমি
আমার বাবার উপহার দেয়া বাংলাদেশকে হায়েনার
কবল থেকে রক্ষা করতে পারছি না। আমার লজ্জায় বাবার চোখ জলে ভাসে।
বলে, স্বাধীনতার পঁয়ত্রিশ বছর পেরিয়ে গেল, একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হয়ে তুমি আজ পর্যন্ত
একজন রাজাকারকে পিটাতে পারলে না
তোমার কি লজ্জা হয় না!? তোমাদের লজ্জা হয় না কেন?

স্বাধীনতার এই পঁয়ত্রিশ বছর পার হয়ে যায় তবুও আমার লজ্জা
বড়ে বই কমে না। আমার বাবা একজন বীরমুক্তিযোদ্ধা। কিন্তু সে
আমাকে নিয়ে গর্ব করতে পারে না। আমার লজ্জা হয় না।
আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার সাথে চলাফেরা করি। সে
আমাকে দেখে না বলা ভাষায় আমার সকল না পারা নিয়ে
তিরস্কার করে। আমার লজ্জা হয় না। আমার বাবার দেয়া স্বাধীন
বাংলায় রাজাকার রাজ করে বেড়ায় আমার লজ্জা হয় না।

স্বাধীনতার পঁয়ত্রিশ বছর চলে যায়
এখনও আমি একজন রাজাকারকে পিটাতে পারলাম না।
বঙ্গবন্ধুর মত এই স্বাধীন বাংলাদেশে আরো একজন
বঙ্গবন্ধুর জন্ম কবে হবে যে আমাকে এই লজ্জার হাত থেকে বাঁচাবে?
সেই নেতা কবে জন্ম নিয়ে কবে আমাকে
চিঠি লিখে বলবে-প্রিয় অরপি রাজাকার মারতে হবে।
স্বাধীনতার পঁয়ত্রিশ বছর পার হয়ে যায়, আমার এই লজ্জা ঢাকার জন্যে
একজন রাজাকার পিটানোর আশায়
একজন রাজাকারের রাজনীতি বন্ধ করার আশায়
একজন রাজাকারকে পিটাইয়া বাংলাদেশ ছাড়া করার আশায়
আমাকে আর কতকাল অপেক্ষা করতে হবে?

(২)

তোমাকে দেখার কালে

গুন গুন করে সময় যে যায় চলে
তোমাকে দেখার কালে।
দিন যায় মাস যায়
বছর যে যায় চলে
তোমাকে দেখার কালে।
হৃদয় নাচে তালে তালে
তোমাকে দেখার কালে।
প্রতিটি মুহূর্ত
সুখের হয়ে কাটে
তোমাকে দেখার কালে।
শুধু ক্ষণ, অনুক্ষণ
তোমাকেই ভালবেসে কাটে
তোমাকে দেখার কালে।
প্রতিটি মুহূর্তে তোমারই
রূপ যৌবন সুধা পান করে
সময় যে যায় চলে
তোমাকে দেখার কালে।
প্রতিটি মুহূর্তে তোমারই
ওষ্ঠে ওষ্ঠ রাখি
তোমাকে দেখার কালে।

যতই দুরে যাই
তোমারই ঐ চোখ
ততই কাছে টানে
তোমাকে দেখার কালে।
যতই কাছে আসি ততই
নাও তুমি টেনে
তোমারই ঐ নরম বুকে
আমারই মাথা রাখো ধরে
তোমাকে দেখার কালে।

যত বুকে মাথা রাখি ততই তোমার উষ্ণ
বুকের মদির গন্ধে পাগল করে
তোমাকে দেখার কালে।
তুমি কাছে টানো, তোমারই অন্ধগলির
মদির গন্ধের আনাচ কানাচ
তুমি খুলে খুলে দেখাও
তোমাকে দেখার কালে।
তোমার শরীরের অন্ধগলির
গোপন গন্ধে। এক গলি ছেড়ে আরেক গলি
তোমারই গন্ধ গলির অন্ধকারে
ডুবে ডুবে যাই বারে বারে
তোমাকে দেখার কালে।
তোমার রক্তে ঝড় উঠে, তুমি পাগল হও
তুমি কাছে আসো, উত্তাপ ঢালো
তোমারই অন্ধ গলির চিরল জলে
ভাসিয়ে বেড়াও।
কামড়ে ধর আঁচল তোল
পাগল হয়ে মাতাল করো এই আমাকে
তোমাকে দেখার কালে।
তোমার ঐ গোপন গলির মদির গন্ধে
তোমার ঐ অন্ধগলির চিরল জলে
তোমার ঐ আঁচড় তোলা কামড়ে ধরা
তোমার সবকিছুতেই
বুকের ভিতর নীলের বিষে, সুখের কষ্ট চলে
তোমাকে দেখার কালে।

(৩)

তোমার লাল টুক টুক

তোমার লাল টুক টুক শাড়ি পরা
লালতো শাড়ির আলতো আলোয়
চিলতে চিলতে কথা বলা
মদির চোখে তাকিয়ে থাকা

তোমার সব কিছুতেই আমার ভাললাগা।
তোমার লাল টুক টুক টিপ পরা
চাঁদের চিলতে আলোয় কপাল দেখা
সেই কপালে লাল টিপের ছোঁয়া
নেশার চোখে সেই লাল টিপের মাঝে
তোমার চাঁদের মত মুখকে দেখা
তোমার সব কিছুতেই আমার ভাললাগা।

তোমার লাল টুক টুক ঠোটের পরে
রক্ত জবা আগুন রাঙ্গা লাল আলপনা আঁকা
তোমার ভিরু চোখের চাহনিতে
লালতো, ঠোঁটের কোনের মৃদু কাঁপন দেখে
বুকের ভিতর লাল আগুন জ্বলে
জেগে উঠে পিয়াস তলে চোখের পরে ঠোঁটের মাঝে
তোমার সব কিছুতেই আমার ভাললাগা।
তোমার লাল টুক টুক দুল পরা
দুলের দোলায় দুলতে থাকা
বেশ আবেশে ঘোরের মাঝে
সেই দুলের মাঝে লাল তোমায় দেখা
তোমার সব কিছুতেই ভাললাগা।

তোমার লাল টুক টুক চুড়ি পরা
ফর্সা হাতের লাল চুড়িতে
তোমার হাতের লালী হওয়া
লালী হাতের লাল চুড়িতে রিনরিনিয়ে সুর উঠা
ঘোরের মাঝে সেই লালী হাতের লাল চুড়িতে
সুরে সুরে তোমায় দেখা
তোমার সব কিছুতেই ভাললাগা।

তোমাার লাল টুক টুক শাড়ি পরা
সেই লাল শাড়ির আলোয়
তোমার মুখে লালের আভা পড়া।
তোমার সেই আলতো চিলতে লালী হওয়া
টোলতো গালের আভা দেখে পাগল হওয়া,
লাল পাগলে নীলি হওয়া, সেই নীলের বিষে
বিষে বিষে তোমার দিকে কাতর চোখে তাকিয়ে থাকা
তোমার সব কিছুতেই আমার ভাললাগা
তোমার সব কিছুতেই আমার ভাললাগা।

মহান মে দিবস ২০০৬ উপলক্ষ্যে দেওয়ান আবদুল বাসেত এর একগুচ্ছ ছড়া

বিদেশে আমরা

‘যৌবন বেইচ্যা খাই’

বিদেশে আমরা যৌবন বেইচ্যা খাই
কেন না আমাদের প্রযুক্তি জ্ঞান নাই।
ইংরেজীর দৌড় ‘ইয়েস-নো-গুড’
তাইতো হামেশাই থাকে ‘বেড মুড’

দিন আনি দিন খাই
মনে সুর -গান নাই,
বেঁচে আছি বলা যায়
তবে তাতে প্রাণ নাই!!
ছাপ করি ঘরদোর
রাস্তা ও গাড়ি,
পার করে পাঁচ সাল
দেশে দিই পাড়ি।

ঢাকাতে নামলে পরে
কতো নাজেহাল,
প্রবাসীর তরে যেনো
‘জাস্ট ন্যাচেরাল’!!
কখনো বা জান দিই
নিজ দেশে গিয়ে,
কারো মাথা ব্যথা নেই
প্রবাসীকে নিয়ে।
আমরা কি তাহলে
পচা-শাক পণ্য?
রেমিটেন্স বেশী দিয়েও
নেই তাতে গণ্য।
আমরা ভোটার নই
তাই কি সতীন?
আমরা কি হবো সেই
বাঘা যতীন!?

২৭এপ্রিল২০০৬ইং
রিয়াদ, সউদী আরব।

(২)

মিডিয়ার সৃষ্টি !!??

মিডিয়ারই সৃষ্টি নাকি
জঙ্গী শায়খ, বাংলা ভাই,
অবশেষে পাল্টে গেলো
বাস্তবতায় জবানটাই।
আবোল তাবোল বকতে গিয়ে
রাখলো না ফাঁক-ফোকর,
খুঁজতে থাকে কীভাবে দেয়
মিডিয়াকে ঠোকর।

সুযোগ এলো খেলার মাঠে,
নাইবা এলো পথে ঘাটে।

বুঝতে দিলো পুলিশ এখন
দেশের সেরা শক্তিধর !?
লাঠি, বাট্ ও বুটের জোরে
দেবে শেষে 'ফিপ্‌টি ফোরে'
উক্তি তবু
ভেড়ার মুখে
ওদের তোরা ভক্তি কর্!?

মিডিয়াকে জব্দ করার
সকল গোমর এবার ফাঁস,
ঢাকতে কী আর পারবে কভু?
দাও যদি ফের উগ্র কাশ!!

আর দেবে না মিডিয়াকে
করতে নতুন সৃষ্টি!?
তাইতো দেখি তোমার উপর
পুলিশ লাঠির বৃষ্টি!!

২১এপ্রিল ২০০৬ইং
রিয়াদ, সউদী আরব।

(৩)

একাত্তুরের যিশু ২০০৬

(কানসাট গ্রামবাসীদের উৎসর্গ)

ফলের রাজা আম
ফল ফলাতে ঝরায় যারা
রক্ত এবং ঘাম!
সেই চাষীরা বাস করে এক
ছোট্ট সবুজ গাঁয়ে,
আঁকাবাঁকা মেঠো পথ আর
আম বাগিচার ছায়ে।

দেশ জোড়া যার গন্ধ আমের
পাখির ঠোটেও ছন্দ ঘামের।
সেই চাষীরা চাইলো তড়িৎ

ধান ফলাবে ধান,
এই চাওয়াতে তাদের বুকে
চললো মেশিনগান!!??
ডজন দুয়েক মরলো চাষী
বুড়ো এবং শিশু,
কানসাট তাই রক্তে রঙিন
একাত্তুরের যিশু!

২৭এপ্রিল২০০৬ইং
রিয়াদ, সউদী আরব।

(৪)

কানসাট দু'হাজার ছয়
বর্ষবরণ ১৪১৩বাঙলা

(সংগ্রামী কানসাটবাসীদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে)

চৌদ্দশ' তেরো
তুমি হয়ে এসো
কানসাটে এবার
বিষমাখা ছুরি 'এ্যারো'!!

তুমি হয়ে এসো
ক্ষিপ্ত বৈশাখী ঝড়,
ভেঙ্গে দাও হাত
ভেঙ্গে দাও দাঁত
কানসাট গাঁয়ে গড়ছে যারা
বিরাণ বালুচর!!

আমার টাকায় কেনা বুলেট
আমার বুকেই মারো!
দেখবো এবার গোয়ার্তুমি
আর কতোটা পারো!

তড়িৎ মন্ত্রী তুমি কহ–
তড়িৎ চাইলে মারবে মানুষ
ছাড়বে তুমি কথার ফানুস
কানসাটতো একাত্তরের
চেয়েও ভয়াবহ!
নয় কি মন্ত্রী কহ..?

তাহলে কী মগের মুল্লুক
আমাদের এই দেশ?!
দেখবো এবার সবাই মিলে
কোথায় ইহার শেষ!!

১৪এপ্রিল২০০৬ইং, রিয়াদ
১লা বৈশাখ১৪১৩বাঙলা